‘‘শরীর নয় মনে’’

মীর সাদেক হোসেন

অমরত্ব যে অসম্ভব তা উপলব্ধি করার জন্য মানুষের বিশেষ কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয়নি। তাই বলে যুগে যুগে বেঁচে থাকার যে আকুতি তাকে তো আর সিল-গালা দিয়ে আটকে রাখা যায় না। মানুষের এই সমস্যার সমাধানে প্রকৃতি তার উপায় বাতলে দিল। বংশ বিস্তারের মাধ্যমে। এক প্রজন্মের কীর্তি তার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে যেন নতুন জীবনের সাধ পেল।

এক প্রজন্ম যে তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের ভালবাসার ফসল, প্রকৃতি তা নানা ছলা-কলার মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে দিল। মানুষও বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিল এই নিয়ম। প্রকৃতি রহস্যময়। কিসের প্রয়োজনে এই নিয়মের দরকার হল তা জানল না মানুষ। রহস্যময় প্রকৃতি সে রহস্য ভাঙ্গল না। প্রকৃতি সাথে পাল্লা দেয়া কার সাধ্য। প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা মানুষের নাই। হবে কিভাবে মানুষ তো প্রকৃতিরই সৃষ্টি। প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয়নি। প্রকৃতি ইচ্ছা করে দেয়নি। দিলে একদিন হয়তো প্রকৃতির নিজের অস্তিত্বই বিপদের মুখোমুখি হতে পারে, সেই কারণেই কিনা চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয়নি। প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষ প্রকৃতি আর সব নিয়মের মতো মানুষ জন্ম দেওয়ার নিয়মটাও নিষ্ঠার সাথে যুগ যুগ ধরে মেনে চলেছে।

ব্যাগটা আরেকবার চেক করে নিল যুবীন। ফিডারে গরম পানি, দুধ, ন্যাপী, ওয়াইপস্, ড্যামী, চেঞ্জ ম্যাট, সিংলেট, জ্যাম স্যুট, হাত মোজা, পা মোজা, মাথার ক্যাপ, বেবি লোশন – বাকী নেই কিছু, সব নেওয়া হয়েছে। বাইরে বেরুলে একি রুটিন তারপরও মনটা কেমন যেন ক্ষুত ক্ষুত করে। সবসময়েই মনে হয় কি যেন বাদ পড়ল। এখন পর্যন্ত তেমন কিছু না হলেও, যুবীন নিজের সন্তানের বিষয়ে একটু অতিরিক্ত সতর্ক। নিজের সন্তান বলে কথা। নামের ধারক, বাহক। তার ব্যাপারে সতর্ক না হলে কি আর চলে।

সবকিছুর ম্যানুয়াল থাকে, ম্যানুফেকচার ওয়ারেন্টি থাকে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে বিকল হলে পরিবর্তনের সুযোগ থাকে কিন্তু মানুষের বেলায় যত বাধল যে গোল। কত অপেক্ষার প্রহর গুনে, কত বেদনার বিনিময়ে এক মানুষ থেকে আরেকটি মানুষের জন্ম হয়। কিন্তু জন্মাবার সময় সেই ছোট্ট মানুষটি লালন-পালনের পদ্ধতির উপর কোন ম্যানুয়াল নিয়ে জন্মায় না। কোন সমস্যা থাকলে তা ম্যানুফেকচারের কাছে ফিরত দিয়ে নতুন আরেকটি আনার কোন অপশন নাই। একমুখী যাত্রা। আর সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ভাষা শিশুর মতো সরল ঠিকই তবে সহজবোধ্য নয়। সব প্রয়োজনে শিশুর মুখে একি ভাষা। ক্ষুধার চাওয়া, ঘুমের চাওয়া সব চাওয়ারই একি ভাষা। প্রয়োজনের মাত্রাটা যত তীব্র শিশুর মুখে উচ্চারিত ধ্বনির তীব্রতাও তত তীক্ষ্ণ। অনভিজ্ঞ বাব-মা’র তখন হয় ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অভিজ্ঞদেরও ধকল কম যায় না। যারা পূর্বে সন্তানের মুখ দেখেছে তাদের কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগলেও সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুটির লালন-পালনের পদ্ধতি শিখতে হয় নতুন করে। কারণ এককেটি শিশু যে একেক রকম। সব বাবা-মাকেই ঠেকে ঠেকে শিখতে হয়।

আর এই একটা বিষয় যা কোন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখানো হয় না তারপরেও সবাই বিশেষজ্ঞ। যুবীনের মনেহয় বিশেষজ্ঞ না বিশেষ-অজ্ঞ। এই বিষয়ে পরামর্শ দাতার অভাব নেই। দরকার হোক বা না হোক পরামর্শ দেবার জন্যেও যেন তারা মুখিয়ে থাকে। পরামর্শ দেবার বেলায় কারও মনে থাকে না যে এককেটি শিশু যে একেক রকম। একজনের বেলায় যা খাটবে অন্যজনের বেলায় তা নাও খাটতে পারে। পরামর্শ দাতা তার অভিজ্ঞতার ঝুলির বিশালতা প্রমাণ করতে কোন ত্রুটি রাখে না।

যুবীন পাঁচ সপ্তাহের ঘুমন্ত জীতুকে স্ট্রলারে বসিয়ে সিট বেল্ট বেঁধে দিল। হঠাৎ ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় জীতু হাত মাথার উপরে তুলে উ শব্দ করে উঠল। একটু ঘাবড়ে গেল যুবীন। ভাবল এখনি জেগে উঠবে হয়তো। উঠলে আর রক্ষে নেই। বাপ-ছেলের আর বেড়াতে যাওয়া হবে না। জীতু মনেহয় বাবার মনের ভাব বুঝতে পারল। স্ট্রলারের ভেতর গুটিসুটি মেরে আবার আগের মতো ঘুমিয়ে গেল।

বেড়াতে যাওয়া মানে এমন দূরে কোথাও নয়। বাড়ির কাছেই। একটা পার্কে। আড্ডাটা বলা যেতে পারে নব্য বাবাদের আড্ডা। কারণ বাবাদের সবাই শেষ সাত-আট মাসের মধ্যে বাবা হয়েছে। একসময় নিজেদের মধ্যে আড্ডা মেরে কাটত। বাবা হওয়ায় জীবনে পরিবর্তন আসবে তাই বলে তো আর আড্ডা বন্ধ থাকতে পারে না। দরকার হলে বাচ্চাসহই আড্ডা হবে।

যুবীনের দরজা খোলার শব্দে লাউঞ্জের সোফায় শুয়ে থাকা অহনা ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল, ‘‘বাবুর দুধ নিয়েছ? শব্দে অহনার ঘুম যেন না কাটে যুবীন তাই খুব সাবধানে দরজা খুলছিল। তারপরও সামান্য শব্দে অহনার ঘুম কেটে গেল। তবে আবার খুব দ্রুতই ঘুমিয়ে পড়ল। মা হবার আনন্দ কম নয় কিন্তু তার জন্য মা হবার আগে–পরে দুই সময়ই সব মা’কেই ভাল পরিশ্রম করতে হয়। জীতুর দেখাশোনা করে অহনার পরিশ্রমও কম হয় না। বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগও তেমন একটা পায় না বললেই চলে।

যুবীন ডেলিভারির পর কিছুদিন প্যাটারনিটি লিভ নিয়েছিল। সে কদিন অহনাও তাও একটু বিশ্রামের সুযোগ পেত। দুই সপ্তাহ লিভের পর যখন যুবীন কাজে ফিরে গেল তখন জীতুকে দেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব অহনা উপর এসে পড়ে। অফিস থেকে ফিরে যুবীন যেয়ে জিতুকে দেখে না তা নয়। তবে দিন আর রাতের বেশীর ভাগ সময় তো অহনাই বেবিসিট করে। রাতে জীতুর কিছু দরকার হলে অহনাই তার দেখাশোনা করে। বিশেষ করে রাতে ঘুমাতে যাবার পর জীতুকে দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন হলে অহনাই ওঠে, যুবীনকে ঘাটায় না। যুবীন অফিস করে, বাড়িতে যত বিল আসে তার দেখাশোনা করে, ছুটির দিনগুলোতে বাজার করা থেকে শুরু করে বাসার মোটামুটি সব কাজ করে। তাই দরকার না পরলে ঘুমাতে যাবার পর অহনা আর যুবীনকে জাগায় না।

যুবীন উত্তর দেবার আগেই অহনার নিশ্বাস ভারী হয়ে এল। যুবীন সোফার পেছন থেকে উকি দিল। দেখল অহনা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চিত হয়ে জীতুকে নিয়ে বেরিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল।

লিফটের কাছে পৌঁছে দেখল পাশের ইউনিটের ক্লারাও লিফটের জন্য অপেক্ষা করছে। গায়ে কালো স্পোর্টস সিঙ্গলেট, কালো স্কিন টাইট থ্রি-কোয়াটার্স আর পায়ে রানিং সু। জগিং করতে যাচ্ছে । শরীরের ভাঁজগুলো যেন স্কিন টাইট সিঙ্গলেট আর থ্রি-কোয়াটার্স ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কোথাও একটু বাড়তি মেদ নেই। দৃষ্টি সরানো কঠিন। ক্লারাকে জগিং করার পোশাকে আগেও দেখছে। কিন্তু যতবারই দেখা হয় শরীরে কেমন যেন টান অনুভব হয়। এই টান অগ্রাহ্য করা সাধ্য পুরুষের নাই। অহনার প্রেগনেন্সির সময়টাতে ক্লারার মতো আরো অনেকের কথা ভেবে যুবীন শরীরের টান হাল্কা করত।

খুব কষ্টে দৃষ্টি সরিয়ে রাখল যুবীন। ক্লারাকে নিয়ে মনের ভাবনাগুলো ক্লারা জেনে ফেলুক যুবীন তা চায় না। তা হবে খুবই আপত্তিকর। এমন ভাব করল যে, ক্লারা যে পাশে দাঁড়িয়ে আছে যুবীনের যেন তা খেয়ালই নাই। মোবাইলে ম্যাসেজ দেখার ভান করে নিজেকে আড়াল করল।

ক্লারাই প্রতিবেশীর সাথে সৌজন্য রক্ষা করার জন্য বলল, ''হ্যালো, কেমন আছো যুবীন? কি কিউট লাগছে ছোট্ট জীতুকে।''

ক্লারার কথায় যুবীনের মনের অস্বাভাবিকতা কেটে গেল। বলল, "থ্যাংক ইউ। তুমি কেমন আছো?"

লিফট দরজা খুলে গেল। যুবীন, জীতু আর ক্লারা লিফটে উঠে পড়ল। লিফট দ্রুত নিচে নেমে গেল। হাল্কা কিছু সৌজন্যমূলক কথার পর যে যার গন্তব্যের উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করল। ক্লারা রাস্তার পাশের ফুটপাথ দিয়ে দৌড় শুরু করে যুবীন আর জীতুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

এক প্রতিবেশীর সাথে সাক্ষাৎ শেষ হতে আরেক প্রতিবেশীর সাথে দেখা। ষাট উর্ধ্ব আলবার্ট হাঁপাতে হাঁপাতে যুবীনের কাছে এসে থামল। তারপর বলল, "হ্যালো যুবিন, কেমন আছো? তারপর জীতুর দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখ কে এখানে...ছোট্ট যুবীন কি বাবার সাথে বেড়াতে যাচ্ছে?"

যুবীন হেসে উত্তর বলল, ''হ্যালো আলবার্ট, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ আমরা এখন বেড়াতে যাচ্ছি।''

"বুঝলে যুবীন, এই সময়টা খুবই আনন্দের। আনন্দের সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায়। যা হোক তোমাদের দুজনের সময় ভাল কাটুক। অল দি বেষ্ট।"

পথে আর কারো সাথে দেখা হল না। স্ট্রলার ঠেলে পার্কে পৌঁছতে যুবীনের মিনিট দশেকের মতো লাগল। ফুটপাত ছেড়ে পার্কে ঢোকার রাস্তায় নেমে পড়ল। কিছুদূর এগুনোর পর দেখল রানা মাঠের পাশে একটা বারবিকিউ ছাউনি দখল করে অপেক্ষা করছে।

যুবীন ছাউনির কাছে পৌঁছে দেখল রানা তার তিন মাস বয়সী ছেলেকে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। রানা যুবীনের বছর দুয়েকের বড়। বড় হলেও কথাবার্তায়, আচার-আচরণে তার ছাপ নেই। বন্ধু হলেও যুবীন রানাকে নামের সাথে ভাই ডাকে।

যুবীন দেখল দুধ খাওনো তো নয় যেন পিতা পুত্রের যুদ্ধ। গুণধর পুত্রের মনেহয় খাওয়ার তেমন একটা ইচ্ছে নেই। বারবার মুখ সরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বাবা দমবার পাত্র নয়। পুত্র যতবার মুখ সরিয়ে নেয়, পিতার খাওয়ানোর উৎসাহ আরো যেন বৃদ্ধি পায়। যুবীনকে দেখে রানা একটু ক্ষান্ত দিল। যুদ্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেনাপতির দৃষ্টি চোখে যুবীনের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল। যুবীন বলল, ''কি রানা ভাই, খবর কি?''

"দেখতেই পাচ্ছ। অবস্থা বেগতিক।"

"আপনার এই অবস্থা তাহলে আমাদের কি হবে? আমার মনে হয় ওর খিদে নেই। একটু অপেক্ষা করে দেখবেন নাকি?খিদে পেলে হয়তো আর মুখ সরিয়ে নেবে না।

তুমি তো দেখি এই কদিনেই ভাল প্যারেন্টিং শিখে গেছ। অভিজ্ঞ বাবাদের মতো কথা বলছ।

কি যে বলেন...অভিজ্ঞদের ভিড়ে তো প্রাণ ওষ্ঠাগত। পাল্লা দেবার মতো জ্ঞান নেই। তা আর খবর-টবর কি? ভাবী, বাচ্চা সব ভাল?

আর বোলো না...ছেলে এখনই গাল-ফ্রেন্ড বাসায় আনতে চাই। রানার ঠোঁটে দুষ্ট হাসি।

যুবীন রানার রসিকতার সাথে পরিচিত। রানা সবকিছু নিয়ে দুষ্টামি করে। ছেলে জন্মাবার পর এখন সে তালিকায় ছেলেও যুক্ত হল। যুবীন অবাক হবার ভান করে বলল, তাই নাকি?

ছেলেকে থামানোর জন্য বললাম, জানিস তোর সমান বয়সে গাল-ফ্রেন্ড বাসায় আনার কথা আমরা চিন্তাই করতে পারতাম না। আর তুই নির্লজ্জের মতো এ সব বলে বেড়াচ্ছিস। বেহায়া।

তখন বেয়াদবটা বলে কি জান...সুযোগের অভাবে নাকি আমরা সৎ ছিলাম।

আপনার ছেলেতো দেখি সেয়ানা হয়েছে। যুবীন বলল। মনে মনে বলল, কে যে গাল-ফ্রেন্ড নিয়ে বাড়ি ফিরতে চায় তা নিয়ে আর ঘাটাঘাটি না করাই ভাল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে যুবীন বলল, আর সব কই? এখনও এল না।

যুবীন এ কথা বলতেই আরো বেশ কিছু গলা শোনা গেল। দুটো স্ট্রলার এসে পাশে থামল। দুটো স্ট্রলার না যেন দুটো ল্যাম্বোরগিনি। স্ট্রলারের যে আকৃতি দেখলে তাই মনে হবে। স্ট্রলারের চালকদ্বয় রাতুল আর সঞ্জু একগাল হাসি নিয়ে দুজনে প্রায় একি সাথে বলল, খুব দেরী করে ফেললাম নাকি?

রানা বলল, আরে না। এই মিনিট পাঁচেক হলও আমরাও এসেছি। এসো, আসন গ্রহণ কর।

রাতুল আর সঞ্জু, যুবীন আর রানার পাশে বসল। রাতুল স্ট্রলারের নিচ থেকে একটা ফ্লাক্স বের করে বলল, বলল, ভাইজানরা চা খাইবেন নি?

রাতুলের প্রস্তুতি দেখে রানা বলল, তুমি তো মিয়া দারুণ প্রিপারেশন নিয়া বেরিয়েছ। বাচ্চাও দেখ, চাও বানাও। গুড ওয়ার্ক, কিপ ইট আপ।

বাচ্চার জন্য দুধ বানাব, পানি গরম করছিলাম। ভাবলাম পানি যখন গরম করছি তখন চা'টা বানিয়েই ফেলি।

যুবীন চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, গুড থিংকিং। তোমার মতো মাল্টিটাস্কিং করতে পারলে লাইফটা অনেক সহজ হত।

সঞ্জু রানার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে গতকাল ফোন দিয়েছিলাম। আজ আড্ডা হবে কিনা সেটা কনফার্ম করতে। মেসেজ রেখেছিলাম ভাবলাম কল ব্যাক করবেন। আজকাল দেখি তাও করেন না।

গতকাল এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। দারুণ এক কাণ্ড হল। রানা একটু থামল। রানার কথা শুনে সবাই দৃষ্টি ফেরাল। ঘটনা বর্ণনা করার আগে রানা পরিবেশ তৈরি করে নিচ্ছে। চায়ে আরো বার দুয়েক চুমুক দিয়ে বলল, খাওয়া-দাওয়া আর ঘণ্টা তিনেক গল্প-গুজবের পর যখন সবাই উঠি উঠি করছে তখন অন্দর মহল থেকে তোমার ভাবীর ডাক এল। সব ডাক উপেক্ষা করা যায় কিন্তু এই ডাক যায় না। তাও আবার নিজের স্ত্রী বলে কথা। ডাক উপেক্ষা করলে যুদ্ধ লাগার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। শুনতে ইচ্ছে করুক আর নাই করুক শুনতেই হবে। আমি ভাই শান্তশিষ্ট মানুষ, যুদ্ধ-বিগ্রহে আমি নাই। বাধ্যনুগত স্বামীর মতো উঠে গিয়ে জানতে চাইলাম, কি? দেখলাম বাচ্চার ফিডার আর ড্যামীটা ব্যাগে ভরে নিতে হবে তাই এই জরুরী তলব। ওই দিন আমার বন্ধু আরো দুটো ফ্যামিলিকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অন্দরে আমার বন্ধু পত্নীসহ দুই ফ্যামিলির দুই ভাবীও ছিল। এতগুলো লোক স্যামনে দাঁত কেলিয়ে বসে আছে আর একটা ফিডার ব্যাগে ভরার জন্য এই জরুরী তলব। যদিও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে দূরে থাকতে চাই তাই প্রশ্ন-টশ্ন একটু কমই জিজ্ঞেস করি। যে যা বলে তাই মেনে নেই। তবে এবার আর ফোড়ন না কেটে পাড়লাম না। সকলকে উদ্দেশ্যে করে প্রশ্ন করলাম, এতগুলো মানুষ সামনে বসে তাহলে কি হচ্ছে? সবার মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, আপনার অপেক্ষা। উত্তরে বলার জন্য জিহ্বা তির তির করে উঠল, শহরের অলিতে-গলিতে তো অনেক মনোরম স্থান আছে। ওইসব স্থানে একটু নীরবে-নিভৃতে-নির্জনে অপেক্ষা করলে কি আরো বেশী ভাল হতো না।

বলেছেন এই কথা? রাতুল অবাক হয়ে চোখে প্রশ্ন করল।

আরে না। রসিকতা করতে যেয়ে বিপদে পড়ি আর কি। সোজা কথাই সোজা থাকে না। আর রসিকতা সে তো অনেক দূর কি বাত।

যুবীন বলল, তাহলে যে বললেন দারুণ এক কাণ্ড হল। কি হল? কিছুই তো হল না।

রানা বিজ্ঞের হাসি মুখে বলল, মনেমনে তো হল। আরেকটু হলে তো সত্যি হয়েই গেছিল।

না হয়ে ভালই হয়েছে। হলে আর আজকের এই আড্ডা হত না। আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সঞ্জু বলল।

রাতুল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্ট্রলার ঠেলছে এমন একজনকে দেখিয়ে বলল, আরে মিজান ভাই না? ওনার কি এখানে আসার কথা ছিল নাকি?

ষ্ট্রলার থামিয়ে সবার উদ্দেশ্য মিজান বলল, সবাই ভালতো? আপনাদের আড্ডার কথা রফিকের কাছে শুনেছিলাম। নব্য বাবাদের আড্ডা। মনে হল বেশ ইন্টারেস্টিং হবে। আর বাড়ির এত কাছে ভাবলাম দেখা করেই আসি।

চায়ের ফ্লাক্সটার দিকে তাকিয়ে মিজান আরো বলল, চা-নাস্তারও দেখি সুব্যবস্থা আছে দেখছি। তাহলে তো জমজমাট আড্ডা হচ্ছে মনেহয়।

রাতুল একটা ডিস্পসেবল কাপে চা ঢেলে এগিয়ে দিয়ে বলল, চা আছে নাস্তা নাই।

মিজান চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, চা'তেই চলবে। তা আপনারা কি আড্ডা মারতে প্রায়ই আসেন?

না -যুবীন বলল। সবার এত এত কমিটমেন্ট একসাথে হয়েই ওঠা হয়না। আজ হঠাৎ হয়ে গেল।

মিজান স্ট্রলারের দিকে তাকিয়ে ছেলে রাজিবের উদ্দেশ্যে বলল, মুখে আঙুল দেবে না। না। না। এখনি বের কর। বের কর বলছি।

সবার দিকে ফিরে মিজান বলল, ছেলে এমন জেদি হইছে, কথা শুনতে চায় না। কোন কিছু করতে মানা করলে কিছুক্ষণ চুপ থাকে তারপর যেই লাউ সেই কদু।

উপস্থিত সবার তুলনায় মিজানের গায়ে কিছু বেশী কাপড় জড়ানো। ফুলহাতা সার্ট তার উপর জ্যাকেট আর গলায় মাফলার। মাঝে মাঝে খুর খুর করে কাশি। একবার তো কাশতে কাশতে রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়ল।

মিজানের এই অবস্থা দেখে যুবীন বলল, মিজান ভাইয়ের কি শরীর খারাপ?

আর বলো না ভাই, জ্বরে কাহিল অবস্থা। গেল সপ্তাহের সোম থেকে বৃহস্পতি অফিস যাইনি। শরীর দুর্বল ছিল তাই শুক্রবার ভাবলাম অফিস গিয়েই বা কি হবে। অজুহাত যখন পাওয়া গেছে কাজে লাগানোই ভাল। পুরো সপ্তাহ বাসায়। জ্বর চলে গেছে তবে কাশিটা বুকে বসে গেছে মনেহয়, যেতে চাইছে না।

রানা মিজানের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, মিজান ভাই, জ্বরের নাম ''কামজ্বর'' না তো? রানার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল।

মিজান খুক খুক করে কেসে নিয়ে বলল, আপনার সব কিছুতেই শুধু মস্করা। জ্বরের আমার কাহিল অবস্থা আর আপনি বলেন কামজ্বর। ঐ জ্বরে কি আর কাহিল লাগে।

কথা শেষ করে মিজান ছেলের দিকে তাকিয়ে মোটামুটি চিৎকার করে উঠল, না না নাকে আঙুল ঢোকাবে না। ই ই ই ই ওই আঙুল আবার মুখে দেয়। এক্ষণই বের কর বলছি।

মিজান হঠাৎ যেভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল মুহূর্তে তা বাতাসে মিলিয়ে গেল। নিজের ছেলেকে দেখিয়ে নাম নিল রানার কিন্তু বলল সবাইকে, রানা ভাই...আমার নদুর তো কদু কেটে দিছি।

তাই...কবে করলেন?

তা প্রায় দু সপ্তাহ হয়ে গেল।

যুবীন জীতুর জন্য করার কথা ভেবেছিল। এতো ছোট বাচ্চার উপর ছুরি-কাঁচি চালালে আবার কিছু হয় কিনা সেই চিন্তায় সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। জিজ্ঞেস করল, এতো ছোট বাচ্চার উপর ছুরি-কাঁচি চালালে ব্যথা পায় না?

যেদিন করিয়ে আনলাম সেদিন ব্যথা একটু পেয়েছিল। অ্যানেস্তেসিয়া চলে যাবার সময়। তারপর সব ঠিক হয়ে গেছে। বড়দের চেয়ে এই বয়সী বাচ্চাদের ঘা শুকাতে খুবই কম সময় লাগে। এখন তো ঘা শুকিয়ে সব ঠিক। দেখলে মনে হবে ঐ টাই যেন ন্যাচারাল। লাইক ফাদার লাইক সান...বলে হে হে করে হেসে উঠল।

মিজান ছেলে দিকে তাকিয়ে আবার না, না করে উঠল। এবারে বেচারা রাজীবের দোষ মুখের ড্যামী মুখ থেকে কাঁথা, স্ট্রলার সব ফাঁকি দিয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া। মুখ খালি সেই সুযোগে আঙুল মুখে পুরে দিল আর সেই সুবাদে বেচারাকে পুনরায় না না শুনতে হল।

রানা মিজানের কথায় আর থাকতে না পেরে বলল, কথা শুনবে কি...কাক ডাকে কা কা, আর আপনার কণ্ঠে না না। কাকের কা কা কার শুনতে কি ভাল লাগে বলেন? বড়ই কর্কশ। আপনার না না-ও হতো ওর কাছে তেমনি লাগছে। এতো না না করে ওকে একটু বোঝার চেষ্টা করে দেখুন না। ওকে বোঝার চেষ্টা করলে দেখবেন দুজনের মধ্যে বন্ধন আরো দৃঢ় হবে সাথে আপনি ওর কাছে কি চান সেটা ওকে বোঝানো সহজ হবে।

কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে মিজান বলল, তাহলে কি কখনই না বলা যাবে না?

না বলার পরিস্থিতি যাতে তৈরি না সেই চেষ্টা করে দেখুন না। রানা আরেকটু যোগ করল।

রাতুলের চিৎকারে মিজান আর রানা কথা বন্ধ করল। রাতুল চিৎকার করে ডাকল, জয়ন্ত, এই জয়ন্ত।

রাতুলের ডাক শুনে জয়ন্ত দিক পরিবর্তন করল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে নব্য বাবা আর তাদের বাচ্চাদের আড্ডায় পৌঁছে গেল। জয়ন্ত বিবাহিত। তবে এখনও সন্তানের বাবা হয়নি।

কি জয়ন্ত, গুরুজনদের পাশ কাটায় যাও কই? রানা ফোড়ন কাটল।

কি যে বলেন রানা ভাই, আপনাকে কি পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়। দেখি নাই যে আপনারা এখানে। আপনাদের এখানে দেখব আমি তো কখনও ভাবি নাই। সাথে বাচ্চারাও আছে দেখছি। এতদিন তো জানতাম মায়েরা বাচ্চাদের নিয়ে পার্কে হাঁটতে বের হয়। এখন দেখি বাবারাও কম যান না। যাহোক আপনাদের দেখে ভাল লাগল। এখন যাচ্ছি ব্যাডমিন্টন খেলতে। যাবেন নাকি? ওখানে বাবারাও ওয়েলকাম।

তোমার তো মিয়া বেবি ওভার ডিউ হয়ে আছে। মিজান খোঁচা দিল। আছো তো মহাসুখে ব্যাডমিন্টন খেলতে যাচ্ছ। বাচ্চা একটা হোক তাইলেই ঠেলা বুঝবা। টাইম কোন দিক দিয়ে যাবে টেরই পাবে না।

জয়ন্ত মুচকি হেসে বলল, আমার ভাই এত তাড়াহুড়া নাই, যখন হবার হবে। আর ভাই আমি শরীরে নয় মনে পিতা হতে চাই। পিতৃত্ব যেন না হয় বেদনাময়, হয় যেন আনন্দময়। আচ্ছা আজকে চলি। নেক্সট উইকেন্ডে আসবেন নাকি? যদি আসেন তাহলে খেলতে যাওয়ার আগে আপনাদের সাথে যোগ দিতে পারি। প্যারেন্টহুড সম্পর্কে জ্ঞান নিলাম। আসলে জানাবেন। চলি তাহলে।

জয়ন্ত চলে যাবার পর রানা বলল, জয়ন্ত কিন্তু ভালই বলছে। শরীরে নয় মনে পিতা হতে চাই। তাইতো শরীরে কুলাইলে তো যে কোন সময় বাচ্চা পয়দা করা কিন্তু মন সায় না দিলে কি বাবা হওয়া যায়।

রানার কথা শেষ হওয়া মাত্র সবার প্রায় একি সাথে মোবাইল বেজে উঠল। কথা শেষ করে যাবার জন্যে সবাই উঠে দাঁড়াল। বেলা ফুরিয়ে এসেছে, আড্ডার জন্য বেঁধে দেওয়া সময় শেষ হয়ে গেছে, এক্ষণই বাড়ি ফিরতে হবে। পাখি সব নীড়ে ফেরে, বাচ্চা আর স্ট্রলারসহ বাবারাও বাড়ি ফেরে।